**আজি হইতে বাংলা সাহিত্য মধ্যে এই উৎকর্ষতা সাধিত হইল**

“কোথায় যাও, আব্বু? আমার জন্য কক্কেট আনবা?”

এভাবেই হরদম কথা বলে চলে সাজিদা। তার বলে চলার এই বাচন যুদ্ধে কখনো শব্দের অস্পষ্ট উচ্চারণ, কখনো বিকৃতি আবার কখনো প্রকৃত শব্দ বেমালুম আড়ালে থেকে একেবারেই ভিন্ন শব্দের অবতারণা। এই যে চকলেট খাওয়ার অদম্য আগ্রহে উচ্চারণের জটিলতাকে তুচ্ছ করে অনায়াসে ‘কক্কেট আনবা’ বায়না পেতেছে। তবে ভাগ্যিস, বাগজড়তার মারপ্যাঁচে তা চকলেট থেকে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়ে ককলেট বা ককটেল হয়ে যায়নি। নইলে রাজনৈতিক এই অস্থিরতার পিরিয়ডে বারুদময় রাজপথের টালমাটাল যত পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি এমনকি তলবকৃত সেনাদল পর্যন্ত গ্রেফতারের নেশায় উম্মুখ হয়ে বাড়ির চারপাশ বেষ্টন করে মিডিয়ার হেডলাইন বনে যেত। তখন হয়তো বৈকরণিক সমীকরণ ‘চকলেট > ককলেট > ককটেল’ বুঝিয়েও পার পাওয়া দায় হতো।

সাজিদার বোল সংগ্রামে অনুকরণের দাপটও কম না। তাই শিখিয়ে দিলে অনুকরণ করে বেশ। হয়তো কখনো সাদ বল্লো, সাজিদা, বলো; “এটা স্টাইল”।  
সে অবলিলায় বলে, “এতা ইছলাইত”।  
কঠিন শব্দকে সহজ পদ্ধতির এ উচ্চারণে সে বেশ খুশি। কিন্তু আমরা হেসে ফেল্লেই বিপত্তি। সে বুঝে, কোথাও একটা গোলমাল পেকেছে। তাই আচমকা চুপ হয়ে যায়। কিছুটা বিব্রতও বোধ করে। তার এ লাজুক মুখভঙ্গি আমাদেরকে আরও আনন্দ দেয়। “শরম পাইছ?” এ কথা শুনে লজ্জায় মরে। আপাতত কিছু বলে না। শুধু অধঃনয়নে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বিকার।

মুরুব্বিয়ানায় সে মুরুব্বিদেরকেও স্তব্ধ করে দেয় কখনো কখনো। পাকনামো বাক্যবানে সংসারের দায়িত্বশীলের সংলাপ রচনা করে জড়তা মাখা কণ্ঠে। আমি একদিন বাইরে থেকে এসে জিজ্ঞেস করলাম,  
-সাজিদা, কি করো?  
-আমার ভাল্লাগে না।  
-কেন?  
-বাছায় ছবায় ছুধু এলোমেলো কলে।  
-সবাই আবার কি এলোমেলো করে?  
-ভাইয়ায় পত্তে বছে না। আপি ছুধু চিল্লাচিল্লি কলে। তয় আম্মুর কছ্ত হয়।

কী নিখাদ মাতৃভক্তিরে বাবা !

লেখাপড়ায়ও তার ভীষণ মনোযোগ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হওয়ার টার্গেটেই বোধ করি এ অদম্য আগ্রহ। তার আগ্রহে হার মেনে সাইজ মত ব্যাগ কিনে দিয়েছি অনেক আগেই। বই খাতাসহ শিক্ষার তাবৎ উপকরণে বোঝাই সেই ব্যাগ । মনের সুখে তা পিঠে নিয়ে হাঁটে ঘরময়। এ রুম থেকে সে রুম। এ খাট থেকে ও খাট। আবার সিঁড়ি ভেঙ্গে তিনতলায়। কখনো কখনো নিচতলায় বা ছাদে। পড়ার নেশা মাথায় চড়লেই নাওয়া খাওয়া বন্ধ। বিশেষতঃ যখন সাদ সাওদা পড়তে বসে তখন আর তাকে ঠেকায় কে! বই নিয়ে দুলতে দুলতে ডুবে যায় যথেচ্ছ পাঠে। চিৎকার করে আবোল তাবোল পাঠের ধ্বনি তুলে চারপাশ উচ্চকিত করে। আবার কখনো ক্ষীণ কণ্ঠে আওড়ে চলে অর্থহীন বুলি। লেখার নেশায় পেন্সিল বা কলম দিয়ে আঁকতে থাকে মনোরাজ্যের অচিনপুরি নানা মানচিত্র। আঁকা বাঁকা নদী, রাস্তা কিংবা মেঠো পথ সদৃশ নানান কিছু। এর মাঝে আবার কোন কিছুর ব্যত্যয় ঘটলে কঠোর অভিযোগ। ভ্রু কুঁচকে ভীষণ বিরক্তি নিয়ে আমাকে বলে,

আব্বু, ভাইয়াকে দাক দাও।

কি করে?

আমাকে দিছতাব কলে।

ভাইয়ারতো কালকে পরীক্ষা।

আমালও পলিক্কা। এই যে আমাল পলিক্কাল খাতা।

ব্যাকরণ বিদ্যায় রয়েছে তার নিজস্ব উদ্ভাবন। ক্রিয়ার কালে শব্দ যখন সময় ও পুরুষের ভিন্নতায় নানা রূপ পরিগ্রহ করে, তার অনেকগুলোই সে মানতে নারাজ। তার যৌক্তিক শব্দ প্রয়োগ অধুনা ব্যাকরণবিদদের জন্যও এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।  
আম্মি, কি খাও?  
কমলা খাই।  
সকালে কি খেয়েছ?  
লুতি খাইছি।  
এখন কোথায় যাও?  
মালকেতে যাই। ছকালে ভাইয়াছ ছাথে ইছতুলে যাইছিলাম।

তার যুক্তি হলো, যদি ‘খাই >খাইছি’ হয়, তাহলে ‘যাই > যাইছি’ নয় কেন?  
বাংলা সাহিত্যের প্যারিচাঁদ মিত্ররা এর কি ব্যাখ্যা দেন জানি না। নাকি শেষমেষ পরাস্ত স্বীকার পূর্বক ‘সাজিদাতত্ত্ব’ খানাকেই গর্জিয়াস সাংবাদিক সম্মেলন কিংবা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে ডিক্লার করে দেন! নিশ্চয়ই তখন গুরুগম্ভীর কথামালা উচ্চারণ করবেন, “আজি হইতে বাংলা সাহিত্য মধ্যে এই উৎকর্ষতা সাধিত হইল”।